একক ২(ক) ❑ চরমপন্থা এবং স্বদেশী আন্দোলন

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ প্রারম্ভিক কথা

২(ক).৩ চরমপন্থার উদ্ভব
  - ২(ক).৩.১ চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পটভূমি
  - ২(ক).৩.২ চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি
  - ২(ক).৩.৩ চরমপন্থী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব
  - ২(ক).৩.৪ চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ
  - ২(ক).৩.৫ চরমপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি

২(ক).৪ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব

২(ক).৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঃ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন
  - ২(ক).৫.১ শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভ
  - ২(ক).৫.২ স্বদেশী আন্দোলনের যুব-সম্প্রদায়
  - ২(ক).৫.৩ স্বদেশী আন্দোলনের সমিতির ভূমিকা—সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড়
  - ২(ক).৫.৪ স্বদেশী আন্দোলনের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা

২(ক).৬ স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য

২(ক).৭ স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

২(ক).৮ সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙন

২(ক).৯ সারাংশ

২(ক).১০ অনুশীলনী

২(ক).১১ গ্রন্থপঞ্জী

২(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থার উদ্ভব এবং কংগ্রেসের ভাঙন অর্থাৎ—

- চরমপন্থী আন্দোলনের আদর্শগত পটভূমি।
- চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।
- চরমপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি।
- বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন।
- স্বদেশী আন্দোলনের নানা প্রবণতা।
- সুরাটে কংগ্রেসে ভাঙন।

২(ক).১ প্রস্তাবনা

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্য কংগ্রেসের সুচনাকালে তার প্রকৃতি ছিল সীমিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং মৃদু। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাঁরা মডারেট বা নরমপন্থী বলে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারের তারা সমালোচনা করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের নীতি ছিল আবেদন নিবেদনের। ব্রিটিশ ন্যায়নীতির উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের শোষণের রূপটিকে তাঁরা 'অ-ব্রিটিশ শাসন' বলে ভাবতে পছন্দ করতেন। এ ছাড়া সমাজের উচ্চবিত্ত স্তর থেকে তাঁরা এসেছিলেন বলে জনসমাজ থেকেও তাঁরা কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সময় এবং পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে আদি জাতীয়তাবাদী নেতাদের নীতি গতি হারিয়ে ফেলেছিল। তারা ত্র(মোগতই সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

২(ক).২ প্রারম্ভিক কথা

আদি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলি দেখা দিচ্ছিল সেগুলিই কংগ্রেসের মূল সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেসের সংগঠনের ভেতরেই ছিল দুর্বলতার বীজ। কংগ্রেসের ভেতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব খুবই প্রকট ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর 'বেঙ্গলী'র সঙ্গে মোতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর একটানা ঝগড়া চলেছিল। হিন্দু ও শিখ ধর্মের তিক্ত(তা পঞ্জাবের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে অবশ্য কেমব্রিজ ঘরানার

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিষয়টাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেন। কংগ্রেসের আরেকটি দুর্বলতা ছিল। কংগ্রেসের আদি নেতারা মুসলমানদের তাঁদের কর্মকান্ডে আকৃষ্ট করতে পারেন নি। আলিগড় আন্দোলনের হোতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দ্বিজাতি তত্ত্ব পরবর্তীকালে মুসলীম লিগের জন্ম দিয়েছিল এবং মুসলমানেরা কংগ্রেসকে একটি হিন্দু সংগঠন বলেই মনে করতেন। আদি জাতীয়তাবাদী নেতাদের অন্য আরেকটি দুর্বলতা ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে কথা বলতেন বটে, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের জন্য কোনরকম সুষ্ঠু নীতি তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। এ ছাড়া জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের শিকড় প্রোথিত ছিল না।

এ সকল সীমাবদ্ধ তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করে সে চেতনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পেরেছিলেন। তাঁদের কাজই ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহলকে জাগ্রত করে তোলা এবং দেশে ও বিদেশে জনমত গড়ে তোলা। হয়তো বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, কারণ শাসনতান্ত্রিক যে সব সংস্কারের দাবীতে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মধ্যে শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা সরকারকে উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তারাই এদেশে প্রথম সাংগঠনিক রাজনীতির নানা পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁদের যুগে তাঁরাই ছিলেন প্রগতির অগ্রদূত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাঁরাই প্রথম নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারায় মধ্যপন্থী হলেও অর্থনৈতিকভাবে ভারতবর্ষের দূরাবস্থার কারণ তাঁরা উদঘাটিত করেছিলেন এবং বিদেশী শাসকের প্রকৃত রূপটি উন্মোচন করেছিলেন। তাঁরা আধুনিক সাম্রাজবাদকে অত্যন্ত তীব্রভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার ভাবেই বলা যায় যে, তাঁদের উদ্যোগকে ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগের আন্দোলন সমৃদ্ধতর হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের এই পথিকৃতদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধ্যপন্থীদের অন্যতম শেষ মহান প্রতিনিধি গোপালকৃষ্ণ গোখলে লিখেছিলেন ঃ

> “আমাদের ভুললে চলবে না যে দেশের অগ্রগতি এখন যে স্তরে আছে তাতে আমাদের সাফল্য সীমিত হতে বাধ্য। নিরন্তর দুঃসহ নিরাশার গ্লানি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। ভাগ্যবিধাতা মুক্তি সংগ্রামে আমাদের এই স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কাজ আমরা যখন শেষ করতে পারব, আমাদের দায়িত্বেরও তখন সমাপ্তি হবে। ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁরা দেশকে সেবা করবেন তাঁদের সফল সাধনা দিয়ে(আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে দেশমাতৃকার আরতি করেই আমরা তৃপ্ত হবো(কঠিন হলেও এই উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাব যে আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি লুকিয়ে আছে।[১]”

---

১. প্রান্তলিপি—নরমপন্থী সমকালেই সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের ভূমিকাকে কটাক্ষ করা হয়েছে ‘রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি’ বা Political mendicancy বলে। বিপানচন্দ্র বলেছিলেন যে ইংরেজ সরকারের কাছে অধিকার ভিক্ষে চাওয়া নিরর্থক। বঙ্কিমচন্দ্রও এই রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে গোখলেই এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

গোখলে আরো বললেন, "আমরা ভিক্ষুক নই এবং আমাদের নীতি ভিক্ষুকজনোচিত নয় "We are not beggars and our policy is not that of mendicancy"—তিনি আরো বলেন, "দেশের স্বার্থের উপর নজর রাখা ও তা রক্ষা করার জন্য বিদেশী দরবারে আমরা জনগণের রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছি।"

সমকালীন সময় ও পরিস্থিতি গুরুত্ব দিলে বোঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা এক কঠিন অবস্থার মধ্যেও দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নেতৃত্ব ছিল প্রাচীন ও বৃদ্ধদের হাতে। তাদের সাহসের অভাব থাকাটাই সঙ্গত ছিল। তবুও একটি বৃহৎ আন্দোলনের শুরু তারা করেছিলেন যা, শেষ হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে এইটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

২(ক).৩ চরমপন্থার উদ্ভব

উনিশ শতকে শেষ দিকে নরমপন্থী চিন্তাধারার সমালোচনা ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এর কারণ ছিল নরমপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে এক হতাশা বোধ। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তার 'আধুনিক ভারতে' বলেছেন যে, "১৮৯০ এর দশকে নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে মোটামুটি সুবিন্যস্ত একটা সমালোচনা গড়ে উঠছিল বিশেষ করে পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের তিনটি প্রধান ঘাঁটিতে অর্থাৎ বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে।' এই সমালোচনা ছিল দ্বিমুখী। এক, নরমপন্থী নেতাদের ব্রিটিশ জনমতের কাছে আবেদনের 'ভিক্ষুকসুলভ' কৌশলকে নিষ্ফল ও অসম্মানজনক বলে মনে করা হল। দুই, আবেদন-নিবেদনের বদলে নতুন স্লোগান হল আত্মনির্ভরতা ও গঠনমূলক কাজ। সূচনা হলো স্বদেশী উদ্যোগের। একটি কথা মনে রাখা দরকার। নরমপন্থী বা 'মডারেট' কিংবা চরমপন্থী বা 'এক্সট্রিমিট' উভয়েই ছিল কংগ্রেসের ভিতরকার গোষ্ঠী। অর্থাৎ চরমপন্থা বলতে সাধারণত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ চরমপন্থাকেই বোঝায়, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদকে নয়। নরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে আভ্যন্তরীণ চরমপন্থাকেই বোঝায়, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদকে নয়। নরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, একটি অ-রাজনৈতিক ধারা যার ধরণ ছিল গঠনমূলক কাজর মাধ্যমে জাতিকে আত্মবিকাশের পথে নিয়ে যাওয়া এবং বিদেশী শাসনকে সোজাসুজি আক্রমণ না করে তাকে উপেক্ষা করা, দুই, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance এর নীতি যার প্রথম প্রবক্তা হলেন লালা লাজপৎ রায়।[২] তিন, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ যা না স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিহনন বা ষড়যন্ত্রের পথকে বেছে নিয়েছিল। এখানে আমাদের চরমপন্থার পর্যালোচনায় (যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন) বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ

---

[২] প্রান্তলিপি—"It is seldom realised that amongest the nationalist leaders of India Lal Lajpat Rai was the earliest expeonent of nilitant nationalsism in the country. He was the first spokesman of the doetrine of Passive Resistance. Addressing the twenty first session of the Indian National Congress at Varanasi in 1905 he said : 'That anethod which is perfectly legidmate, perfectly constidutional and perfectly justifiable is the method of passive resistan.— Militant national in India— Bimanbehari Majumdar P 65-66.

ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে চরমপন্থী ভূমিকায় মূল্যায়ন করব।

আগেই বলা হয়েছে যে, নরমপন্থী নেতৃত্ব ক্রমাগতই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের দমনমূলক নীতি চালিয়েই যাচ্ছিল যা কিনা নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করছিল। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন, ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমাগতই ক্ষোভের সঞ্চার করছিল। বেকারত্ব ও অমর্যাদা শিক্ষিত ও বুদ্ধি জীবী শ্রেণীর মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, এই বুদ্ধি জীবী শ্রেণীরাই একসময় ব্রিটিশ শাসনকে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' বলে মনে করতেন। অরবিন্দ ঘোষ 'পুরানোর বদলে নরম বাতি' নামে এক প্রবন্ধগুচ্ছে নরমপন্থী রাজনীতির সমালোচনা করেন। কংগ্রেস ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি আক্রমণ করেন এবং মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সর্বহারার যোগসূত্র গড়ে তোলার কথা বলেন। অবশ্যই অরবিন্দের কাছে 'সর্বহারার' অর্থ ছিল গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা।

বাংলায় কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহভঙ্গ করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৯৭-এ কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনকে তিনি 'তিন দিনের তামাশা' বলে ব্যঙ্গ করেন। অশ্বিনীকুমার বরিশালে স্কুল শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু তার নিজের জেলায় সমাজসেবার মাধ্যমে তিনি এক অনন্য ধরনের গণসমর্থন গড়ে তোলেন। ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনের দিনগুলিতে বরিশাল একটি বড় ঘাঁটি ছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গের কথা ব্যক্ত করেন। ''যুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে।'' যুরোপের প্রতি তার এই মনোভাব পর্যবসিত হচ্ছে অন্য এক উপলব্ধিতে যখন তিনি একই প্রবন্ধে[৩] লিখলেন, ''ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, যুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে যুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য।' কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন যে কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। ''দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্য সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপরওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্রীক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে, এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড় করা দোহাইপাড়া মুক্তিফৌজের চিত্তদৈন্যকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি, সে তুমি জ্ঞান''। ভিক্ষাবৃত্তি বর্জন করে তিনি জোর দেন আত্মশক্তির ওপর। স্বদেশী উদ্যোগ ও জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমেই আত্মশক্তির বিকাশ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। শিক্ষা অথবা রাজনৈতিক কাজ— যে কোন ক্ষেত্রেই তিনি মাতৃভাষা ব্যবহার করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আইরিশ ও অন্যান্য ইওরোপীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

---

[৩] প্রান্তলিপি— বিশদভাবে পড়ার জন্য পড়ুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধটি।

নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বিবেকানন্দের শিষ্যা মার্গারেট নোবেল বা নিবেদিতা। আরো অনেকেই স্বদেশেই উদ্যোগের কথা বলেছিলেন এবং সেইমতো কাজ করতে চাইছিলেন। ১৮৯৩-এ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল শু(করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থাপিত করেন তাঁর ডন সোসাইটি।

দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনমানসে এক পরিবর্তনের প্রত্রি(য়া ঘটে চলছিল। মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলনের মানুষের মনে আর কোন সাড়া জাগাতে পারছিল না, তাঁদের জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটছিল এক নতুন শ্রেণীর নেতার। তাঁদের দাবী আরো চরম ছিল বলে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা চরমপন্থী বলে পরিচিত। নরমপন্থী বা মধ্যপন্থীরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে তাদের প্রভাবকে বিস্তার করতে পারেন নি, এবার চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের ডাক পৌঁছে দিলেন এক ব্যাপকতর সামাজিক পরিধিতে। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ, ছাত্রসমাজ ছাড়িয়েও কৃষক ও মজুরদের কাছে তাঁদের আহ্বান পৌঁছে গেল।

২(ক).৩.১ চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পটভূমি

চরমপন্থীদের চিন্তাধারার মধ্যে গড়ে উঠেছিল যাকে উয়েনবী বলেছেন archaism বা অত্যধিক প্রাচীনতা প্রীতি। এই চিন্তাধারাকে অমলেশ ত্রিপাঠি[৪] তিনটি স্তর থেকে দেখেছেন আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। আধ্যাত্মিকভাবে চরমপন্থীরা সনাতন হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্মের মুখোমুখি হয়ে যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তার প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন থেকে অরবিন্দ বেশ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। উপনিষদের যুক্তি(ও অঘ্যাত্মচেতনা, কর্মোদ্যম ও ফলত্যাগের দিকে তারা জনমানসের মনোযোগকে আকৃষ্ট করেছিলেন। সাংস্কৃতিক ভাবে তাঁরা পশ্চিমী যান্ত্রিক, জড়বাদী এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী সভ্যতাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সব দিক দিয়েই ভারতের অবদান প্রথম ও শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছ থেকে ভারতীয়দের আর নতুন কিছু শেখার প্রয়োজন নেই। সেখানকার সংস্কৃতি বস্তুবাদের বিষে জীর্ণ বলে তাঁরা মনে করতেন(অন্যদিকে তাঁরা বি(াস করতেন ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার ভেষজই পারবে এই জড়বাদী বি(কে পুন(জ্জীবন দান করতে। তাই রাজনীতিগতভাবে তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় অস্তিত্বকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার হাত থেকে র(া করতে, চেয়েছিলেন নিজেদের সভ্যতার উৎসে ফিরে তাকাতে। পশ্চিমী অনুকরণ নয় ভারতের প্রাচীন আত্মা আবিষ্কারের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি(র পথ। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, রাজনৈতিক সমস্যার

---

৪. প্রান্তলিপি—"A rebound from the mimess fo the west, it (extremism) oscillatred to another extreme — memesses of ancient India Baru of a psycology of fear, it inclucated aggressiveness in tone and temper. Repelled by the inferiority complex of the anglisized Indian, it bred the equality unhealthy superiority complex of the Orghodex Indian."— The extremist Challange, Amalesh Tripathi P.1.

সমাধান না হলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না, সে সমাধানের জন্য ইংরেজ বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতার বহিষ্কারও দরকার।

নরমপন্থা বা মডারেট রাজনীতির নরম সুরের বদলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিয়ে এল এক কড়া ও আগ্রাসী মনোভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা তাদের আকাঙ্খিত জাতীয় বীরকে দেখতে পেলেন। বালগঙ্গাধর তিলক গীতার একটি টীকাভাষ্য লিখলেন। তার ভূমিকাটি লিখলেন অরবিন্দ ঘোষ। লালা লাজপত রায় উর্দুতে শ্রীকৃষ্ণের একটি জীবনী রচনা শেষ করলেন আর অশ্বিনীদত্ত ভক্তিযোগ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেন। 'শ্রীকৃষ্ণতত্ব' লিখলেন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যয়। আবার যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'ভারতবর্ষের আত্মা' বা The soul of India। আবার শুধু ধর্মে নয় ইতিহাসের মধ্যে তাঁরা শিবাজী, রানা প্রতাপ সিংহ, ও গুরু গোবিন্দ সিংহের মধ্যে তাঁদের নায়ককে খুঁজে পেলেন। এই ভাবনা থেকে জন্ম নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, রমেশচন্দ্র দত্তের রাজপুতজীবন সন্ধ্যা, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ইত্যাদি রচনা। ১৯০৪ সালে তিলক শুরু করলেন শিবাজী উৎসব।

এ কথা মনে করা হয় যে, চরমপন্থীরা তাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়, বিবেকানন্দের শিক্ষায় এবং দয়ানন্দের পাশ্চাত্যবিমুখীতায়। মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার উৎস। হিন্দু ধর্মকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন যে বহু দেববাদ ও বিভূতি, দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম নয়। ''ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে ও সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব মানবহিতে উৎসর্গে হিন্দুধর্মের সারতত্ব নিহিত। তিনি এর নাম দিলেন অনুশীলন ধর্ম।'' ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখলেন সেই পুরুষোত্তমকে যিনি সুকঠিন প্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং মানবহিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বুদ্ধ বা যীশুর মত শ্রীকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করেন নি বরং সংসারের দুঃখকে বরণ করেছেন বীরের মত, কর্ম করেছেন নিরাসক্তভাবে। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তাই সে যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ। নতুন এক কুরুক্ষেত্রের আহ্বান করলেন তিনি, নতুন এক ধর্মযুদ্ধের ডাক দিলেন। তাঁর এই কল্পনা চরমপন্থী ভাবধারার মানুষকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিলক, অরবিন্দ লাজপৎ রায় তো বটেই, ব্রাহ্ম বিপিন পাল ও ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ব্রহ্মব্রান্ধবও এই প্রভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। তাঁর 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সারা দেশে এক প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। দেশ হলেন 'মা', ভারতবর্ষ হলো ভারতমাতা। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে কালীকে তিনি তার রূপে দেখলেন—'মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, এবং মা যাহা হইবেন।' 'মা যাহা হইয়াছেন' এর কালী 'হৃতসর্বস্বা তাই নগ্নিকা'। অরবিন্দ এই কালীর মধ্যে দেখলেন ব্রিটিশ শোষিত ভারতকে। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন 'মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে.....না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?'' বঙ্কিম অবশ্য সত্যানন্দের গুরুর মুখ দিয়ে জড় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারে ও জাতীয়তাবোধ জাগরণে ইংরেজদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন কিন্তু অরবিন্দ তাতে গুরুত্ব দেন নি। আর বঙ্কিমের দু দশক পর তিলক গীতার যে

ভাষ্য রচনা করেছিলেন তাতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ধর্মযুদ্ধে কোন পন্থাকেই তিনি অন্যায় বলে মনে করেন নি। এমন কি 'শিবাজী উৎসব'-এ (১৮৯৭) আফজল খাঁর হত্যাকাণ্ডকে তিনি কৃষ্ণের উক্তি দ্বারাই সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা বঙ্কিমের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চরমপন্থীরা তাদের চিন্তাধারাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চরমপন্থীদের সামনে স্বামী বিবেকানন্দ অন্য এক আদর্শের পরে স্বপ্ন তুলে ধরেছিলেন। অতীত নিয়ে ভারতবর্ষ যে দিবাস্বপ্নে মগ্ন ছিল তা ভেঙে দিয়ে বিবেকানন্দই শক্তির কথা বললেন, সাহসের কথা বললেন, যা দিয়ে এক ভবিষ্যতের সৌধ গড়ে তোলা যায়। প্রাচ্য ও পশ্চাতের সমন্বয়ের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের মঙ্গলকে দেখতে পেয়েছিলেন। পশ্চিমের বীর্য, কর্মোদ্যম, সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দুঃখমোচনের নিরলস প্রয়াসকে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। আর পশ্চিমে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সত্য, ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ। তিনি বললেন, শূন্য উদরে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। তিনি যে ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার লক্ষ্য ছিল বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে আত্মার ব্রহ্মস্বরূপকে ব্যক্ত করা। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর The extremist challange-এ লিখছেন, "The master left a mission, Diserimination, detachment, devotion should all be geared to one great purpose—awakening and unfolding the divinity in man." শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি বেদান্তের বাণী ও রামকৃষ্ণের উপদেশ প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। উপনিষদের মন্ত্রকে অবলম্বন করে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানালেন, 'ওঠ জাগো'। প্রবল পৌরুষের কথা তিনি বলেন(বললেন, "আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"। বঙ্কিমের দেশ ছিল কবির কল্পনা। তাতে বিবেকানন্দ দিলেন রক্ত, মাংস, মজ্জা। দেশ কোন বায়বীয় বস্তু নয়, সর্বস্তরের মানুষকে নিয়েই দেশ। বিবেকানন্দের কাছে দেশ হলো তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী। এই দেশ দরিদ্র্যের দেশ— তাকে অন্নদান, আরোগ্যদান, জ্ঞানদান করতে হবে। আত্মজ্ঞান আসবে তখনই। বললেন, কোন মানুষ কোন জাতি পরস্পরকে ঘৃণা করে বাঁচতে পারে না। ভারতবর্ষের কাল তখনই ঘনিয়ে এসেছে যেদিন থেকে সে 'ম্লেচ্ছ' কথাটি আবিষ্কার করেছে অন্যের সাথে এক ব্যবধান তৈরী করেছে। এই জাতপাতের বিভেদ দূর করতে পারলেই সৃষ্টি হবে এক মহান শক্তির যে শক্তির কাছে যে কোন বাধাই তুচ্ছ হয়ে যাবে। ভারতীয়দের দুর্বলতাকে কটাক্ষ করে তিনি বললেন, "পৃথিবীতে পাপ যদি কিছু থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ। সবরকমের দুর্বলতাকে বর্জন করো, দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতাই মৃত্যু.......তোমার শরীর, মন, আধ্যাত্মবোধকে যা দুর্বল করে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করো। দুর্বলতা জীবনহীনতার, অসত্যের লক্ষণ।" চরমপন্থীরা বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন, উদ্দীপিত হলেন তাঁর উপদেশবাণীতে। বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চান নি কিন্তু চরমপন্থীর দুই হোতা অরবিন্দ ও তিলক রাজনীতিতে হিন্দুধর্মকে কাজে লাগালেন। বিপিল পাল বললেন, ভারতবর্ষের রাজনীতি হলো একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বর্তমান। ঈশ্বর যেহেতু অনন্তকালের জন্য

মুক্ত, মানুষের মুক্তিও অনন্তকালের। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।[৫] অরবিন্দ ও বিপিন পাল দুজনেই বললেন যে, স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় কথা। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

চরমপন্থীরা উনিশ শতকের আরেকজন ধর্মীয় নেতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন— তাঁর নাম দয়ানন্দ স্বরস্বতী। রামমোহন ও বিবেকানন্দ বেছে নিয়েছিলেন বেদান্তের ঐতিহ্য, বঙ্কিমের উৎস ছিল গীতা ও ভাগবত, দয়ানন্দ বেছে নিলেন বেদকে। বেদকে তিনি অমোঘ ও অভ্রান্ত বলে মেনে নিলেন অস্বীকার করলেন পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের যে কোন বিবর্তনকে। শুধু বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম নয়, তিনি অদ্বৈততত্ত্ব গীতার ভক্তিবাদ, পুরাণের মূর্তিপূজা সবই বর্জন করেছিলেন। দয়ানন্দের চিন্তাধারায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি কোনরকম প্রভাব ফেলতে পারে নি। চরমপন্থীরা ইংরেজদের জাত্যাভিমানের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন আর্য শ্রেয়োমন্যতা দিয়ে। এইখানে তাদের গুরু ছিলেন দয়ানন্দ স্বামী। দয়ানন্দের কাছে বেদ ছিল ঈশ্বরের বাণী, তার মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিক, জীবনের প্রথম ও শেষ কথা নেই, আছে জড়বিজ্ঞানের সকল তথ্য। বেদ ব্যাখ্যায় ম্যাক্সমুলারকে তিনি অবজ্ঞা করতেন আবার সায়নভাষ্যও সব জায়গায় মানেন নি। তিনি মনে করতেন ঋক্‌বেদ শুধুমাত্র প্রকৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রার্থনা নয়, তা একেশ্বরবাদের প্রথম ও পূর্ণরূপ। তাঁর নিজের মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন নিজের রচনা ‘সত্যার্থপ্রকাশে’। তাঁর অন্যধর্ম সম্পর্কে এই অসহিষ্ণুতা চরমপন্থীদের চিন্তায় স্থান পেয়েছিল। দয়ানন্দের আর্যসমাজ শুদ্ধি’র মাধ্যমে অ হিন্দুদের হিন্দুত্ব দিতে গিয়ে মুসলিমদের সন্দেহভাজন হলো। পঞ্জাবে আর্যধর্ম ছড়িয়ে পড়ল, লালা লাজপৎ রায় তা বরণ করলেন।

বঙ্কিম, বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দের আদর্শে চরমপন্থীদের যে চিন্তার জগতটি রচিত হয়েছিল তা হলো এক ‘আদর্শ ভারতে’র স্বপ্ন। সে আদর্শ ভারতটি কেমন? এই আদর্শ ভারতের ধমনীতে প্রবাহিত হবে আর্যরক্ত এবং হিন্দুধর্মই হবে এই ভারতের ধর্ম। এই আদর্শ ভারতের গৌরবময় ইতিহাস গড়েছেন শ্রীকৃষ্ণের মত অতিমানব ও শিবাজীর মত যোদ্ধা। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে তার অবদান প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। অরবিন্দ ও বিপিন পালের মতে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মত মহৎ পশ্চিমে কিছু নেই। তবে রাজনীতি ও হিন্দু ধর্মকে একাকার করে ফেলে চরমপন্থীরা অন্য ধর্মের সমর্থন হারালেন।

---

[৫] প্রান্তলিপি— বিপানচন্দ্রের বক্তৃতার জন্য পড়ুন ‘The New Movement, leature at Madras 1907, Swadeshi and Swaraj.

“It (politics) has its application in social, in economic in political life of the sublime philosophy of the Vadanta. It means the desire to carry the message of freedeom.......and we are to carry out that messafe, to realize that ideal in the social, economic and the political life. What isthe message of the Vedanta ? The message of the Vedanta is the that every man has we their himself, in his own soul as the very root and realization of his own being the spirit of god, and as god is elenally free, self realized, so is every man eternally free and; self-realized. Freedom is mans birth right.”

২(ক).৩.২ চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক মনে করতেনযে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজসংস্কার মিশিয়ে ফেললে গোঁড়া রক্ষণশীলরা কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। তাতে ক্ষতি হবে আন্দোলনের। তিনি চাইলেন ঐতিহ্যপন্থী, ইংরেজী শিক্ষা বঞ্চিত অথচ দেশী ভাষায় শিক্ষিত জনগণের এক বৃহদাংশকে কংগ্রেসে সামিল করতে। সামাজিক ভাবে চরমপন্থীরা তাই হয়ে উঠলেন প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁরা বললেন যে বিদেশী রাজশক্তির আইনের মাধ্যমে যদি সমাজ সংস্কার করা হয় তবে তা বিদেশী রাজশক্তিরই শক্তি বৃদ্ধি করবে। তাই ১৮৯১ সালে তিলক সহবাস বিষয়ক আইনকে সমর্থন জানান নি। তিনি সংস্কারকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও বহু পুরাতনপন্থী, দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত লোকের সমর্থন পেলেন।[৬]

ঔপনিবেশিক শোষণের ধারা অব্যাহত থাকাতে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এক হতাশাবোধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ না পেয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা ক্রমশঃ সরকারী চাকুরী বা আইন ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অনেক উদ্যোগী যুবক আবার সাংবাদিকতাকে তাঁদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯০৩ সালে সারা ভারতে মাত্র ১৬,০০০ ভারতীয় কর্মচারী ছিলেন যাঁদের মাইনে ৭৫ টাকার বেশি। আইনের ক্ষেত্রেও সাফল্যের সম্ভাবনা কম ছিল আর সাংবাদিকতা তখনও খুব অনিশ্চিত পেশা। সফল ডিগ্রীধারীদের চাইতে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে এমন যুবকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। চাকুরীর ক্ষেত্রে এরা ছিল যোগ্যতাহীন। এদের মধ্যেই হতাশার ভাব সবচেয়ে বেশী তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সম্পন্ন পল্লীজীবী এবং সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও অসন্তোষের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছিল। মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলন এদের নাড়া দিতে পারে নি। চরমপন্থী আন্দোলনের নেতারা এদের কাছে তাঁদের ডাককে পৌঁছে দিলেন।

২(ক).৩.৩ চরমপন্থী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাইরের জগতে এক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ এ পরিবর্তনে প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা পেল। ১৮৬৮ র পরে জাপানের এক আধুনিক ও শক্তিশালী জাতিরূপে অভ্যুত্থান হয়। পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ে জাপান গড়ে ওঠে এক শিল্পোন্নত, শক্তিশালী, সামরিক দেশ হিসাবে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে জাপান বাধ্যতামূলক করেছিল আর তার শাসনব্যবস্থা হয়ে উঠল দক্ষ এবং আধুনিক। পশ্চিমের কোনরকম সাহায্য ছাড়া এশিয়ার একটি ছোট

---

[৬] প্রান্তলিপি— জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে তখনকার চরমপন্থীদের সমাজ প্রগতি বিরোধী ভাবধারার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

দেশের এ হেন উন্নতি ভারতীয়দের মধ্যে এক প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করল। তাই জাপান ভারতীয়দের কাছে হয়ে উঠল এক অননুকরণীয় আদর্শ। ১৮৯৬-এ ইথিওপিয়ার কাছে ইটালীর পরাজয় ঘটল এবং ১৯০৫ এ রাশিয়া হেরে গেল জাপানের কাছে। এ দুটি ঘটনা পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি যে অপরাজেয় নয় সে কথা প্রমাণ করল। এদিকে আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং চীনে সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ভারতবাসীর মনে এক নতুন আশার বানী শুনিয়েছিল। তারা বুঝতে পারল যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে নিজের আদর্শের জন্য প্রচন্ডতম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়।

২(ক).৩.৪ চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বালগঙ্গাধর তিলক, যিনি পরবর্তীকালে লোকমান্য আখ্যা অর্জন করেন। সি. জি. আগারকরের সহযোগিতায় তিনি ইংরেজীতে ‘মারাঠা’ ও মারাঠীতে ‘কেশরী’ নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর সাংবাদিকতার দক্ষতাকে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সমর্থনে দলমত সংগঠিত করতে কাজে লাগিয়েছিল। তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তিনি জাতীয়তাবাদের বার্তা পৌঁছে দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতে তাদের আত্মত্যাগী ও নির্ভীক হতে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন যে, “অনেক দিন থেকে তিলক ছিলেন পথিকৃৎ। যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গণসংযোগের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার (সহবাস সম্মতি বিষয়ে তিনি জোট বাঁধেন সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে, আর তারপরে ১৮৯৪ থেকে সংগঠিত করেন গণপতি উৎসব), জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে একই সঙ্গে স্বাদেশিক তথা ঐতিহাসিক ভজনা গড়ে তোলা (শিবাজী উৎসব, এটি তিনি সংগঠিত করেন ১৮৯৬ থেকে) এবং এর সঙ্গে ১৮৯৬-৯৭ এ এক ধরনের রাজস্ব বন্ধ অভিযানের পরীক্ষা।” ভাইসরয় এলিগন যখন ভারতীয় মিলে তৈরী কাপড়ের ওপর শুল্ক বসালেন তিলক তখন ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ‘যদি আমরা বছরে একবার ব্যাঙের মতো গ্যাঙর গ্যাঙর করি তাহলে আমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হবে।’ ১৯০২ এ একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন, “নিপীড়িত ও অবহেলিত হলেও ইচ্ছে করলে প্রশাসনকে অকেজো করে দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের আছে(নিজেদের সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তোমরাই রেলপথ ও টেলিগ্রাফ পরিচালনা কর, তোমরাই যারা বসত গড়ো ও রাজস্ব আদায় কর.....।” ‘কেশরীতে’ একটি প্রবন্ধে তিলক শিবাজীর হাতে বিজাপুর সেনাপতি আফজল খাঁর হত্যাকে সমর্থন জানান। সব মিলিয়ে তিলক ব্রিটিশ সরকারের উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ান। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে ১৮৯৭ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। দুবছরের কারাদন্ডে তাঁকে দন্ডিত করা হয়। কংগ্রেসের সবাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কারণ এক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রশ্নটি বিপন্ন হয়েছিল। তিলকের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। দেশবাসী নতুন জাতীয়তাবাদের প্রতীকরূপে তিলককে স্বীকার করে নিল।

লোকমান্য তিলক ছাড়া আর যারা চরমপন্থী আন্দালনের পথিকৃৎ তাঁরা হলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপৎ রায়। এদের বিষয়ে পূর্বেই বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের কর্মসূচীর তিনটি দিক ছিল। এক, তারা চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে তাদের হীনাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং এ সংগ্রামের পথ ক্ষুরধারসম তীক্ষ্ণ। তাঁরা তাই তাদের দেশবাসীকে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। দুই, বিদেশী শাসনকে তাঁরা ঘৃণা করতেন। স্বরাজ ছিল তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য। তিন, তাঁরা জানতেন যে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে গণ আন্দোলনের পথ ধরে তাই তারা আস্থা স্থাপন করেছিলেন জনসাধারণের ওপর।

২(ক).৩.৫ চরমপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পালে যখন চরমপন্থার হাওয়া জোরদার হয়ে বইতে শুরু করেছে তখন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। উনিশ শতকের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক সংকটের মুখে এসে পড়েছিল। ফরাসী ও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও তাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং পশ্চিমে আমেরিকা ও প্রাচ্যে জাপানের মত দুটি প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এ সংকটের দিনে অনেকের মধ্যে কার্জনও সাম্রাজ্যরক্ষার কাজে এগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসবিরোধী, হিন্দুবিরোধী ও খানিকটা বাঙালী বিরোধী। শাসিতের প্রতি কোন সহানুভূতিই তাঁর ছিল না। ভারতীয়দের চরিত্র, সততা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব খারাপ। কার্জনের শাসননীতি দেশবাসীর মৌলিক অধিকারে আঘাত হানল।

প্রথমেই তিনি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে হাত দিলেন। কলকাতা পৌরসভা ছিল স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক। সুতরাং পৌরসভার গঠনতন্ত্রের ওপর আঘাত করে তাঁর অভিযান শুরু হল কলকাতা কর্পোরেশনে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস পেল। সদস্য সংখ্যা হল একশতের জায়গায় পঞ্চাশ।

দ্বিতীয় আঘাত পড়ল শিক্ষার ওপর। শিক্ষা সংস্কারের নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নেওয়া হল। সরকারী কর্তৃত্বকে আরো জোরদার করা হলো। কার্জন যে ইউনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করলেন তার সুপারিশ হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দিতে হবে, আইনের ক্লাস বন্ধ করতে হবে এবং ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। কমিশন আরো বললেন যে সিনেট সদস্যদের কার্যকাল ও সংখ্যা কমিয়ে আনা দরকার। কলেজগুলিকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রেও তাঁরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার সুপারিশ করেন। শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের আইন কলেজ টিকে গেল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শাসনতন্ত্র ঠিক হল তাতে ইউরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলো। গোখ্‌লে বললেন যে, এই নীতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী বিভাগে পরিণত হবে। সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন এই সময় তাই জোরালো হয়ে উঠেছিল।

এরপর কার্জন প্রবর্তন করলেন Official Secrets Amendment Act. এই আইনের বলে অসামরিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশনার জন্য সংবাদপত্রকে দণ্ডনীয় করা হয়। কার্জন চেয়েছিলেন গণ সমালোচনার হাত থেকে অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের বাঁচাতে। এ নীতি প্রেস স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে তুমুল আপত্তি উঠল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। চরমপন্থীরা এ সুযোগ ছাড়লেন না।

কার্জনের বিদেশনীতিও ভারতীয়দের সমালোচনার সম্মুখীন হলো। বৈদেশিক খাতে ভারতের অর্থসম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন কার্জন। দিল্লীর দরবারে এবং তিব্বতের অভিযানে তিনি ভারতের অর্থ জলের মতো ব্যয় করেন।

এমনিতেই নানা কারণে অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল। কার্জনের জনবিরোধী নীতি সেইসব অসন্তোষে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সব অসন্তোষ ফেটে পড়ল বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। ১৯০৩ সালে নানা আলোচনার পর কার্জন ঠিক করেছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত হবে। উড়িষ্যার সম্বলপুর ও গঞ্জাম বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবে। ব্রিটিশ প্রশাসনের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে আসামের উন্নতি ঘটবে এবং বাংলার ভার কমবে। কিন্তু ১৯০৫ সালে দেখা গেল পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছে তাতে যুক্ত করা হয়েছে চট্টগ্রাম ছাড়াও ঢাকা ও দার্জিলিং বাদে রাজশাহী বিভাগ, ত্রিপুরা ও মালদহ। বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া হয় প্রচণ্ড। ব্রিটিশ সরকার এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অস্বীকার করলেও স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ. এইচ. বিজলির নোটে ভারত ভারত সরকারের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই নোটে বিজলি বলেন, ‘‘সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা ঐক্যহীন। ......আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী এক সুসংহত দলকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া..........একথা খুলে না বলে একটা সরকারী নথিতে এর উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়।’’

কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবই চরমপন্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিল। সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হবার আগেই ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকা বিদেশী বর্জনের ডাক দিল।

২(ক).৪ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব

কার্জনের দমননীতি ভারতীয় জনসাধারণের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। সবচেয়ে অপ্রিয় হলো বঙ্গভঙ্গ। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, কার্জনই বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রস্তাব দেন নি। যখন বাংলা প্রেসিডেন্সি ১৮৫৪ সালে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় তখনই তার আয়তন ছিল ২,৫৩,০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় প্রশ্ন ওঠে এতবড় প্রদেশের সুশাসনের জন্য কি করা উচিত। তখনকার বড়লাট জন লরেন্স বললেন যে বাংলার কিছু অংশ, যেমন আসাম ও তার সন্নিহিত জেলাগুলিকে, আলাদা করে দেওয়া যেতে পারে। ১৮৭৪ সালে বাংলাভাষী সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাসহ আসাম এক স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের প্রদেশ বলে ঘোষিত হল। কিন্তু কোন

সিভিলিয়ান এই ক্ষুদ্র প্রদেশে যেতে রাজী হল না বলে ১৮৯৬ সালে চীফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু প্রবল প্রতিবাদের ফলে এ প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় নি। তারপর বিস্তর আলোচনার পর ১৯০৩ সালে ঠিক হল চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামে যাবে, ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে, বাংলা পাবে সম্বলপুর ও গঞ্জাম। এতে বাংলার লোকসংখ্যা কমবে এক কোটি নয় লক্ষ, আসাম প্রশাসনের সুবিধা বাড়বে, ওড়িশাবাসীরা এক শাসনাধীনে আসবে। প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও বলা হল যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ববঙ্গ কলকাতাতর বিপজ্জনক প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সাম্প্রদায়িকতার সুর এবং ভেদ ও শাসনের নীতি এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। রিজলে মন্তব্য করলেন, “সংযুক্ত বাংলা, শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হবে। কংগ্রেস নেতারা এই ভয় করছেন। তাঁদের আশঙ্কা নির্ভুল এবং সেটাই এই প্রস্তাবের সবচেয়ে বড়ো গুণ। আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী এক সুসংহত দলকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া।” কার্জন ঢাকার বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন— মুসলিমদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ রচনাই তাঁর লক্ষ্য। রিজলে ও ফ্রেজারের মন্তব্যে ফরিপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার চরমপন্থী কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রশাসনের আশা ছিল বাংলাকে ভাঙলে এদের দমন করার সুবিধা হবে বঙ্গভঙ্গের পূর্ণ প্রস্তাব ১৯০৫ এর ১৯ এ জুলাই ঘোষিত হল এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যে পরিণত করা হল।

২(ক).৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন : স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন

সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সারা বাংলা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় বঙ্গব্যবচ্ছেরে পরিকল্পনাকে একটি “গভীর জাতীয় বিপদ” বলে অভিহিত করলেন। সকল স্তরের বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে সামিল হলো। জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, দরিদ্র নগরবাসী এবং ছাত্রসম্প্রদায় সকলেই কমবেশী করে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হলেন। কার্জন যে ঐক্যের মূলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তা আরো পল্লবিত হয়ে উঠল। আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ মধ্যপন্থীদের হাতে, কিন্তু অচিরেই বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থীরা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় যেহেতু মডারেট নেতাদের নেতৃত্বে ছিল তাঁরা তাদের কৌশলমাফিকই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন যে, “১৯০৩-১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন হিসাবে মডারেটদের চিরাচরিত কৌশলের পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।” অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা সভা-সমিতি করে তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। কলকাতা ছাড়াও মফঃস্বলের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য প্রতিবাদী সভা-সমিতির অনুষ্ঠান

হয়। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতার টাউন হলে বহু জেলা প্রতিনিধিরা উপস্থিতিতে বড় দুটি সম্মেলন হয়। বাংলার জমিদারদের অনেকে তাঁদের রাজভক্তি দূরে সরিয়ে রেখে আন্দোলনকে সমর্থন জানান। মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দী, এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই প্রতিবাদ সভায় সামিল হন।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অন্ততঃ পাঁচটি বিখ্যাত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল ‘‘লর্ড কার্জনকে খোলা চিঠি।’’ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাগুলিতে বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু মডারেটপন্থীদের সমস্ত আবেদন নিবেদন নীতি ব্যর্থ হয়ে গেল যখন সবকিছু অগ্রাহ্য করে সরকার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। মডারেটরপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে শুরু হলো আন্দোলনের নতুন নতুন প্রক্রিয়ার সন্ধান। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সঞ্জীবনী’তে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের ডাক দেওয়া হল। টাউন হলের সভায় সুরেন্দ্রনাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতারা যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সেটি গ্রহণ করেন। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের আবেদন জানান। এই দিনটি সারা দেশে উদ্‌যাপিত হলো শোকদিবস হিসেবে। সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলো। রবীন্দ্রনাতের স্বদেশী গানে উত্তাল হলো সারা দেশ। হিন্দু মুসলমানের হাতে, মুসলমানেরা হিন্দুর হাতে ভ্রাতৃবন্ধনের রাখী পরালেন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল বরিশাল, ময়মনসিংহের মতো মফঃস্বল জেলাগুলিতেও। বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে গোখ্‌লে বললেন, বঙ্গভঙ্গ ‘‘নিষ্ঠুর অবিচারের পরিচায়ক’’। ‘‘বর্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসনের নিকৃষ্টতম দিকগুলি বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমলাতন্ত্র মনে করে বিচক্ষণতায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অথচ জনমতের প্রতি তার ঘৃণা অপরিসীম, মানুষের সযত্নলালিত আবেগ, অনুভূতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। শাসিতের স্বার্থের চেয়ে শাসনযন্ত্রের স্বার্থ তার কাছে অনেক বড়ো।’’

‘স্বদেশী’ ও ‘বয়কট’ সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে নতুন ছিল না। আমেরিকা, আয়ার্ল্যান্ড ও চীনের সংগ্রামীরা ১৯০৫ এর আগেই এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ভারতবর্ষেও স্বদেশী ভাবাদর্শ আগেও প্রচারিত হয়েছে। বয়কটের কথাও ১৮৭০ এর দশকে ভোলানাথ চন্দ্র ব্রিটিশ জনমতকে জাগ্রত করার উপায় হিসাবে বলেছিলেন। তিলক ১৮৯৬ এ একটি বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আবার স্বদেশী ও বয়কট নতুন ভাবে গুরুত্ব পেল।

স্বদেশী আন্দোলনের ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। গঠনমূলক স্বদেশী ছিল তার প্রথম ধারা। নিষ্ফল ও আত্মঅবমাননাকর ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতি বর্জন করে, স্বদেশী শিল্প গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তাকেই গঠনমূলক স্বদেশী বলে বলা হল। রবীন্দ্রনাথ ‘স্বদেশীসমাজ’ প্রবন্ধে এই গঠনমূলক কাজের কথা বিশদ্ করে বলেছিলেন। আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথাই তিনি বার বার করে বলেছেন। তবে বয়কটকে তিনি মনে করতেন ‘দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।’ শুধুমাত্র ভাঙন কোনদিনই দেশের কল্যাণ করতে পারবে না তাই আত্মশক্তির ধীর ও অনাড়ম্বর বিকাশের কথাই তিনি বলেছিলেন।

শিক্ষিতজনের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের মাধ্যম হল মাতৃভাষা— বললেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর The swadeshi Movement in Bengal—1903-1908 এ দেখিয়েছেন যে "From July 1905, reliance on self help or atmasakti seemed to have become for a time the creed of whole bengal." এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মত স্বদেশী কাপড়ের কল, উন্নত তাঁত, চীনামাটি, চামড়া, দেশলাই ও সাবানের কারখানা, এমনই কি জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ গড়ে ওঠে। স্বদেশী বলতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার বৃহদাকার ও আধুনিক শিল্পের কথাই বুঝেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করেচিলেন তা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথও একটি স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছিলেন। সবরকম সরকারী বা বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি শিল্পমূলধন গড়ে তুলেছিলেন শুধুমাত্র স্বদেশী চাঁদাকে অবলম্বন করে। আজও এই কোম্পানী দেশের গর্বের বিষয় হয়ে রয়েছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলন এক নতুন প্রাণের জোয়ার এনেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের কবিতা ও গান এবং অন্যান্য প্রবন্ধাবলী জাতির জীবনে এক আবেগের সঞ্চার করেছিল। স্বদেশপ্রেমের গান রচনা করলেন রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাশ প্রমুখ কবিরা। মুকুন্দ দাশের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' বহু সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নতুন ধরনের সাংবাদিক রচনা প্রকাশিত হতে লাগল।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা 'বয়কট'কে প্রাধান্য দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলের মত নরমপন্থীরা বয়কটকে একটা সাময়িক এবং রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে দেখতেন। গোখলের মতে 'বয়কট কথাটির মধ্যে "অপরের প্রতি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনা" রয়েছে। বয়কট "নিজেদের মধ্যেই অপ্রয়োজনীয় অন্তর্বিরোধ জাগিয়ে তোলে।" নরমপন্থীরা মনে করতেন যে বয়কট দ্বারা ব্রিটিশ অর্থনীতির ওপর চাপ পড়লেই বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হবে। কিন্তু তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ আরো ব্যাপকভাবে বয়কটের কথা বললেন। বয়কটের মাধ্যমে তারা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ উৎপাদনকেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়াও সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তুলতে। তিলক এই বয়কটের নাম দিয়েছিলেন 'বহিষ্কারের যোগ।' তাঁরা বয়কট বলতে শুধু কাপড়, চিনি, নুন বর্জন বোঝেননি, তাঁরা শিক্ষা, বিচার, পৌরসভা, আইন পরিষদ সর্বক্ষেত্রেই একে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ এর নাম দিয়েছিলেন 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'।[৭] আবেদন নিবেদন, স্বনির্ভরতা আগ্রাসী প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের থেকে এর প্রকৃতি আলাদা।

---

[৭] প্রান্তলিপি— "The theory of passive resistance acquired its finished form mainly through the writings of Bipinchandra and Aurobindo during 1906-07 'Our method is passive resistenced which means as organised determination to refuse to render any voluntary and honorary service to the government, declared pal in september 1906..........But the classic statement of course came from Aurobindo April 1907-clearly demarcating "passive resistance" from "petidioning", "self development and self help and and also from "aggressive resistance" of armen revolt"—Sumit Sarkar, The Swadesbahi Movement in Bengal—1903-1908.

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা এই ব্যাপক বয়কটের একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। 'স্বরাজ লাভ' করার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার শিক্ষা প্রয়োজন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি স্থাপন করে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনের পথ দেখান। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে ব্রজমোনহ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সতীশচন্দ্র ডন পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) ও কার্লাইল সার্কুলার (১৯০৫) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সক্রিয় করল। স্থাপিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ। নরমপন্থীদের চেষ্টায় স্থাপিত হলো বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। প্রথমটির অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ। তিন বললেন যে, এ শিক্ষায় যে সাংস্কৃতিক জমি তৈরী হবে তাতে উৎপন্ন হবে স্বাধীনতার ফসল।[৮] ন্যাশানাল কলেজের লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং শিল্পোদোগী রূপে গড়ে তোলা। ছাত্রদের স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করার জন্য ঠিক হয়েছিল যে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার জন্য নেতারা বৃত্তি দিয়ে অনেক ছাত্রকে জাপান পাঠালেন। ক্রমে ক্রমে সারা দেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো।

বয়কট নিয়ে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতদ্বৈধতা থাকা সত্ত্বেও কলকাতার টাউন হলের সভায় বয়কট প্রস্তাব পাশ হলে বয়কট আন্দোলন সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা বয়কট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকাশ্যভাবে শুরু হল ব্রিটিশ পণ্যের বহ্ন্যুৎসব। যে সব দোকানে ব্রিটিশ দ্রব্য বিক্রী হতো সেগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং করতে লাগল। স্বদেশী জিনিস উৎপাদন ও বিক্রিকে কেন্দ্র করেও তুমুল উৎসাহ দেখা গেল। স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য মোটেই সীমিত ছিল না। বয়কট আন্দোলন সরকারের সঙ্গে সকল সংস্রব বর্জন করার দিকে এগিয়ে চলল। সংগঠিত অসহযোগিতা দিয়ে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারী হাত তাঁরা পঙ্গু করে, চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দিতে।

২(ক).৫.১ শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক কৃষকেরাও যোগ দিলেন। চরমপন্থীরা কৃষক ও মজুরি শ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক তত্ত্বের চাইতে 'স্বদেশীর' কথা তাদের মর্মমূলে পৌঁছল। তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বদেশীর ডাকে সাড়া দিল। বিহারে চম্পারণে নীল চাষীরা বিদ্রোহ করল। আসাম ও ময়মনসিংহেও কৃষক বিক্ষোভ দেখা দিল। বরিশালের মুসলমান চাষীদের আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। শ্রমিক আন্দোলন এইসময় এমনই তুঙ্গে ওঠে যে ইঙ্গ ভারতীয়

---

৭. প্রান্তলিপি— সুমিত সরকার তাঁর আধুনিক ভারতে লিখেছেন "অবশ্য ছাত্রসম্প্রদায়ের বড় অংশকে জাতীয় শিক্ষা আকর্ষণ করতে পারে নি, কারণ তাতে চাকরীর সম্ভাবনা ছিল নগণ্য।"

পত্রিকা 'পায়োনিয়ার' ২৭ আগষ্ট ১৯০৬ প্রবল অসন্তোষের সঙ্গে লেখে যে, রাজনীতিবিদ মনের খুশীতে বঙ্গবিভাগের ব্যাপারে বা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি অজ্ঞ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করেন......সমগ্র প্রদেশের মঙ্গলকে বিঘ্নিত করেন.......তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারের নিজেকে জানান দেওয়ার সময় হয়েছে। ধর্মঘট হলো প্রেসে, গড়ে উঠল মুদ্রাকরদের উনিয়ন, ১৯০৬ এর জুলাই মাসে পুর্বভারতীয় রেলপথের কেরানী ধর্মঘটের থেকে গড়ে উঠল রেলপথকর্মী ইউনিয়ন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে চটকলগুলিতেও প্রায়শই ধর্মঘট হয়। কিছু কিছু চরমপন্থী পত্রপত্রিকা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের রুশীয় পদ্ধতির বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করছিল। তবে এ ধর্মঘটগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনটাকেই রাজনৈতিক ধর্মঘট বলা যায় না। ''স্বদেশীদের যোগাযোগ বেড়েছিল মূলত কেরানীদের, বা খুব বেশী হলে, বাঙালী চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে।'' ১৯০৮ এর পর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীরা হঠাৎই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২(ক).৫.২ স্বদেশী আন্দোলনে যুবসম্প্রদায়

দেশের যুবসম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান দায়িত্বটি বহন করেছিল। দেশ জুড়ে তাদের উদ্দীপনা সংগ্রামের বাণীকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর' 'কেশরী' প্রভৃতি চরমপন্থী পত্রিকাগুলি তাদের আরো উৎসাহিত করতে লাগল। যে যুবসম্প্রদায় ও ছাত্রসমাজ তীব্র নৈরাশ্যে দিন কাটাচ্ছিল তারাই প্রতিটি শহরে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলল। ''মাথায় হলদে পাগড়ি, গায়ে লাল সার্ট'' এই সাজে সজ্জিত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সরকারী স্কুল, কলেজ এবং অফিস বর্জন করে বেরিয়ে এল, কণ্ঠে তাদের স্বদেশী গান আর বন্দেমাতরম ধ্বনি।''[৯] সরকারের দমননীতির কশাঘাত তাদের ওপরই তীব্রভাবে পড়ল। ছাত্ররা সরকারী বৃত্তি বা সরকারী চাকরির সুযোগ হারাল। সারা পূর্ব বাংলা এবং আসাম জুড়ে চলল এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। ছাত্রদের ভাগ্যে জুটল জরিমানা, বহিষ্কার, এমনকি নিদারুণ শারীরিক প্রহার। এই দমননীতির ফলই পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে গিয়ে দাঁড়াল।''

২(ক).৫.৩ স্বদেশী আন্দোলনের সমিতির ভূমিকা-সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড়

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার জেলাগুলিতে বহু সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিগুলি নানা ধরনের কাজে যুক্ত ছিল। সমিতিগুলিতে শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও উৎসবের সময় সমিতির সদস্যরা সক্রিয় ভাবে সমাজ সেবায় অংশ গ্রহণ করত ও নানারকমভাবে স্বদেশে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করত। ১৯০৭ এ পুলিশের খবর অনুযায়ী কলাকাতায় ১৯টি সমিতি ছিল। পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠেছিল কিছু সমিতির যারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের পথ নেয়। সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব' ফরিদপুরের 'ব্রতী', ঢাকার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তরে'র নাম উল্লেখযোগ্য।

---

৯. প্রান্তলিপি— বিশদ বিবরণের জন্য পড়ুন 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে।

এই সমিতিগুলির কাজের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যও ছিল। কলকাতাভিত্তিক সার্কুলার বিরোধী সমিতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতির নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তার জেলায় হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পুলিনবিহারী দাস প্রতিষ্ঠিত ঢাকা অনুশীলন গুপ্ত প্রশিক্ষণে সদস্যদের শিক্ষিত করে তুলেছিল। সুমিত সরকার আধুনিক ভারতে লিখছেন, ...“১৯০৮ পর্যন্ত সমিতিগুলির একটা বড়ো অংশের মুখ্য কাজ ছিল গণসংযোগ, কখনও কখনও তা আবার নানান ধরনের খুবই কল্পনা ঋদ্ধ মাধ্যম গ্রহণ করেছিল, শুধুই প্রচুর পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা বা ভাষণ নয়, তার সঙ্গে ছিল দেশাত্মবোধক গানের বন্যা, নাটক ও যাত্রার মতো লোক মাধ্যমের ব্যবহার। বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বাগ্‌রীতির পরিচর্চা।” তবে ক্রমশই জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর জন্য হিন্দুধর্মকেই ব্যবহার করা হতে লাগল।

তবে ১৯০৮-০৯-এর মধ্যেই পুলিশী নির্যাতনের জন্য প্রকাশ্য সমিতিগুলি প্রায় লুপ্ত হলো। অনুশীলন ও যুগান্তর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিলো। অরবিন্দ তাঁর ভাই বারীন্দ্রের এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে কলকাতায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।[১০] সমিতিগুলিকে তিনি জাতির গৌরব বলে আখ্যা দিলেন (The glory of our national life for the last three years) এবং সমিতিগুলি শরীর শিক্ষার ওপর জোর দিলেন। ধীরে ধীরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রথম বিপ্লবী প্রজন্মের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক অনন্য নাম বলা যেতে পারে। ১৯০৮ এ বিদেশ থেকে সামরিক শিক্ষা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। স্থাপিত হয়েছিল মানিকতলার বাগান বাড়িতে একটি বোমার কারখানা। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর হাতে কেনেডী হত্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অরবিন্দ সমেত গোটা দলই ধরা পড়ল। পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন আরো অনেক বেশী করে সংগঠিত ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে খুব বেশী করে প্রভাবিত করেছিল। “দেশাত্মবোধক গানের সম্পদ ও অন্যান্য যথেষ্ট পরিমান সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব ছাড়াও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল স্বদেশী বাঙলার সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার।” সুমিত সরকার ‘সন্ত্রাসবাদ’ শব্দটিকে সমর্থন করেছেন কারণ এই বিপ্লবী আন্দোলন কখনই নাগরিক গণ অভ্যুত্থান বা গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের রূপ নেয় নি। “অত্যাচারী রাজকর্মচারী বা বেইমানদের খতম করা, তহবিল জোগাড়ের জন্য স্বদেশী ডাকাতি আর খুব বেশি হলে, ব্রিটেনের বিদেশী শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় সামরিক চক্রান্ত—বিপ্লবী আন্দোলন এইসব রূপ নিয়েছিল।”

বাংলার এই চরমপন্থী আন্দোলনের জোয়ার পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে বাংলার অনুকরণে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী পণ্যদ্রব্যের বয়কট কিছুকাল চলে। অজিত সিং

---

১০. প্রান্তলিপি— ‘The best conemporary analysis of the origins of the samitis-certainly the most significant organisation contribution of the swadeshi age-was made by Aurobind in a specie at Howrale in 1909”— The Swadeshi Movement in Bengal— 1903-1908. Sumit Sarkar.

(যিনি আঞ্জুমান-ই-মোহিবান-ই-ওয়াতন নামে একটি সংগঠন লাহোরে স্থাপন করেছিলেন) বাঙালী চরমপন্থীদের একাংশের পথে চলে যান। সরকার লাজপৎ ও অজিত সিংকে দীপান্তর পাঠালে, দমন নীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করায় পাঞ্জাবে আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

মহারাষ্ট্রে তিলক এই সময়ে বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব শুরু করেন। তাঁর উদ্যোগে বোম্বাই-এ মদের দোকান প্রভৃতিকে ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে পিকেটিং করা শুরু হয়। বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে কেশরী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে তিলককে সরকার ছয় বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করলে শ্রমিকরা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ধর্মঘট দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বোম্বাই এর দোকান পাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়। মহারাষ্ট্রের নাসিক ও শোলাপুরে প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধে। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, মহারাষ্ট্রের আন্দোলনের পিছনে বেশ ভালোরকমই গণসমর্থন ছিল।

মাদ্রাজেও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অন্ধ্র এবং মাদ্রাজে প্রতিবাদ সভা হয়। বিপিন পাল অন্ধ্র ও মাদ্রাজ ভ্রমণ করার পর এই আন্দোলন আরো প্রবল হয়। ছাত্রেরা "বন্দেমাতরম" লেখা জামা পরে প্রতিবাদ জানায়। স্বদেশীর প্রভাবে তেলেগু সাহিত্য নবজীবন পেল। কিন্তু মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই এবং অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও গ্রেপ্তার হলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। চরমপন্থীরা বাংলার মতই সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেন।

২(ক).৫.৪ স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় অংসখ্য মুসলমান নাগরিক এগিয়ে এসেছিলেন। পাটনার লিয়াকৎ হোসেন বয়কটের চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়ার রেলওয়ের ধর্মঘটেরও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বরিশালের সভার সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। আইনজীবী আবদুল হালিম গজনাভি স্বদেশী শিল্পের উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ব্রিটেনে তৈরী চামড়ার জিনিস বয়কট করার আন্দোলন তিনিই পরিচালনা করেন। বাংলার বাইরে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দেবার কাজে অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন আবুল কালাম আজাদ। তবুও এই সময়েই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। যদিও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বারবারই বলা হচ্ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রেরা এক স্মরণীয় শোভাযাত্রা ১৯০৫ এ করেছিল। আন্দোলনে মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্রিটিশের বিভেদ ও শাসন পদ্ধতিই সফল হয়েছিল। মুসলমানদের ব্রিটিশরা বোঝাতে পেরেছিল যে নতুন প্রদেশ মানেই আরো বেশী চাকরি, আরো বেশি মুসলমানদের জন্য সুবিধা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মানেই হিন্দুদের আন্দোলন, এ থেকে দূরে থাকাই মুসলমানদের বাঞ্ছনীয়, ইংরেজদের এই টোপ মুসলমানরা খুব সহজেই গ্রহণ করল। হিন্দু মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহার নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের একটি পৃথক সংগঠন তৈরী হল যার নাম হল মুসলীম লীগ। পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আন্দোলনের ক্ষতি করছিল। অবশ্যই দাঙ্গাকারীদের লক্ষ্য

ছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনেরা। কিছু কিছু মুসলিম প্রচারমূলক লেখাপত্রে জমিদার মহাজন শোষকদের সঙ্গে এক করা হয়েছিল হিন্দুদের।

তবে ১৯০৭-০৮ এ পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, দাঙ্গার জন্য শুধু ব্রিটিশদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দেশবাসীকে তিনি সাবধানবানী শোনালেন, “এ কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইয়া চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে করিয়াছে.....শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।” স্বদেশী নেতারা অনেকেই এই ছিদ্রের সমস্যা সমাধান না করে বয়কট জোর করে চাপাতে চেয়েছিলেন।

২(ক).৬ স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য

ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর The Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908 এ বলেছেন যে স্বদেশী যুগে যে ভাবধারা ও আদর্শবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছিল—এটি স্বদেশী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এই সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। সুতরাং ভারতবাসীর মঙ্গল ইংরেজদের দ্বারা হবে এ ধারণা একেবারেই ভুল। স্বরাজই হবে ভারতবাসীর একমাত্র আকাঙ্খিত দাবী। মডারেটদের সংস্কারপন্থী দাবীতে সন্তুষ্ট না থেকে দেশবাসী স্বরাজ সাধনের দাবীতে তীব্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে গঠনমূলক স্বদেশীর কথা বলা হয় অর্থাৎ গ্রাম সংগঠন, গ্রামীণ আদালত গঠন, মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষা, কুটির শিল্পের প্রসার এবং বিলাতী মাল বয়কট ও স্বদেশী জিনিসের প্রতি আগ্রহ, এ সবই ভবিষ্যতের গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ভূমি রচনা করেছিল। সুমিত সরকার বলেছেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলনের কলাকৌশলের অভিনব যেটা ছিল সেটি হল অহিংসার বাণী।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর যে সৃজনশীলতা, সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল তা এক কথায় অভূতপূর্ব। বাঙলা ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ লেখেন দীনেশচন্দ্র সেন। আবার বাংলার রূপকথাকে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ রূপে প্রকাশ করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘গোরা’ ও ‘ঘরে বাইরে’ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশকে অবলম্বন করে গানগুলিও এই সময়ে রচিত হয়। স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন ছোট গল্প আর ঐতিহাসিক গবেষণামুলক গ্রন্থ হিসেবে নিখিলনাথ রায়ের ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনী’ অক্ষয়কুমার মৈত্রের ‘সিরাজউদ্‌দৌলা এবং মীরকাশিম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক চিত্র পত্রিকা এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অক্ষয়কুমার। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ যুগে তাদের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

স্বদেশীভাবে উদ্দীপিত হয়ে রাধাকুমুদ মুখার্জী, হারানচন্দ্র চাক্লাদার রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং সমাজবিদ বিনয় কুমার সরকার তাদের রচনাগুলি লিখেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার এইসময় তাঁর বিখ্যাত ঔরংজেব রচনা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যার সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৯০৪ থেকে ১৯১১) ১৯০৭ সাল প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়। এর সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরোক্ষ হলেও স্বদেশী আন্দোলন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার প্রভাব ফেলেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের প্রাণ ও অনুভব শক্তির প্রমাণ দেন। বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে স্বদেশ প্রেম যুক্ত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অগ্রণী ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে তাঁদের বিজ্ঞান সাধনা বিশ্বসংস্কৃতির জগতে বাঙলার একটি চিরস্থায়ী স্থান করে দেবে।[১১] মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ এইসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হন ও পরবর্তীকালে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বদেশীয়ানা খুব বড় রকমের প্রভাব ফেলে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও নাটোরের মহারাজার উদ্যোগে ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ স্থাপিত হলে বাংলায় ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণা পান ওকাকুরা, নিবেদিতা এবং হ্যাভেলের কাছ থেকে। ইয়োরোপীয় শিল্প বর্জন করে তিনি ভারতীয় শৈলীতে ফিরে আসেন। ভারতের মহান শিল্প ঐতিহ্যকে সামনে তুলে এনেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজপুত ও মুঘল শিল্পকলা বা অজন্তার গুহাচিত্র অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের প্রেরণা জোগায়। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য তার গুরুর রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন পর্যায়ই সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ ছিল না। এই সময়ে রচিত সঙ্গীতগুলি পরবর্তীকালের আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে। ১৯০৯ সালে মর্লে মিন্টো সংস্কার কোন গোষ্ঠীকেই খুশী করতে পারল না বরং মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিল। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অনুপ্রেরণা হয়ে রইল পরবর্তীকালের গান্ধীর আন্দোলনের জন্য। সুমিত সরকার বলছেন যে, নিশ্চিতভাবেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ব্যর্থতা ছিল সাময়িক কারণ ১৯১৮ সালের পর থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলি স্বদেশী দিনের অনেক কলা অনেক কৌশলকেই পুনর্বার ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু অন্তবর্তী বছরগুলিতে আন্দোলনের গতি যে ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল সে কথা প্রশ্নাতীত ভাবেই সত্য।

---

[১১] প্রান্তলিপি— অধ্যাপক সুমিত সরকার বলছেন যে এই অগ্রণী ব্যক্তিদের কাছে বিজ্ঞান ও দেশপ্রেম সমার্থক ছিল। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করতেন যে তাঁদের গবেষণা ভারত তথা বাংলাকে বিশ্বসংস্কৃতির মানচিত্রে স্থান করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছে। এই সচেতনতা আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপে বিস্তারিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২(ক).৭ স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বদেশী আন্দোলন থিতিয়ে পড়ার পেছনে অনেকগুলি কারণকে ঐতিহাসিকরা দায়ী করেছেন। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর 'Extremist Challange' গ্রন্থে বলেছেন যে 'The movement began with a bang and ended with a whimper' পুলিশী নির্যাতনকে অবশ্যই একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয় যে আন্দোলনকারীরা বেশীদিন পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে পারে নি। সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর হাতে দমন করা হয়। সভা সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা নেতাদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসী, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রভৃতি শাস্তিদানের ফলে আন্দোলন হীনবল হয়ে পড়ে। তবে পুলিশী অত্যাচারই যে আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সে কথা বলা যায় না। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা বয়কটকে সমর্থন করেন বটে কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সহায়তা ছাড়া বিলাতী মালের বয়কট সম্ভব ছিল না। অমলেশ ত্রিপাঠী একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখিয়েছেন যে, বয়কট আন্দোলন আদপেই বিলাতী মাল আমদানীর ওপর ছাপ ফেলতে পারেনি। এছাড়া বয়কট আন্দোলন সফল হবার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বদেশী দ্রব্যের প্রাচুর্য্য। কিন্তু স্বদেশী প্রচার করলেও যথেষ্ট প্রমাণ তাঁত ও রেশমের কাপড় উৎপন্ন না হওয়ায় সে প্রাচুর্য্য ছিল না। গরীব চাষীদের ওপর জোর করে বয়কট চাপানোর ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা যায়। কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলার বিরাট ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান ও তাদের ভবিষ্যৎ তৈরী করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল চাকুরী লাভের সোপান। বয়কটের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো, আন্দোলনে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রাধান্য। কৃষকদের অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে আন্দোলনকে যুক্ত করা হয় নি। কৃষকরা তাই এই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগাযোগ খুঁজে পায় নি। মার্কসবাদীদের মতে আন্দোলনটি ছিল অনেকাংশেই এলিটিষ্ট। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের হিন্দু জাগরণবাদের আদর্শ মুসলমানদের ক্ষুণ্ণ করেছিল ও তারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।[১২] মৌলভী আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি নেতারা যারা গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলন সহযোগিতা করেছিলেন, তারাও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

চরমপন্থী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথ ধরায় তা গণ সংযোগ হারিয়ে ফেলে। যদিও বিপ্লবীদের মধ্যে সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের অভাব ছিল না। তবুও সন্ত্রাসবাদের ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন কখনোই ভেঙে পড়ার মতো বড়ো বিপদে পড়ে নি। চরমপন্থীরা জনতার সংগ্রামকে সংঘটিত করার

---

[১২] প্রান্তলিপি— দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ১৯০৬এর মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, কুমিল্লায় (মার্চ ১৯০৭) জামালপুরে (এপ্রিল-মে, ১৯০৭) দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সীগঞ্জে।

কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। সংগ্রামের আন্তরিক আহ্বানকে তাঁরা শ্রমিক চাষী বা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি। “নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগের আদর্শ তাঁদের কাছেও শুধুই ভাববিলাস হয়েই রইল। তাঁদের নেতৃত্বেও এমন কোন সম্ভাবনাময় জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠল না, যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়। তিলক প্রমুখ নেতারাও মনে করতেন যে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি একমাত্র ধনতান্ত্রিক পথেই সম্ভব, তাঁদের দৃষ্টিও ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করতে পারে নি। চরমপন্থীরা তাঁদের পূর্বসূরী মধ্যপন্থীদের চেয়ে একটি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপর ছিলেন। এ দেশ যে বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত এ সত্যটি তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের ভাবাদর্শে ছিল উচ্চ বর্ণ এবং হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস পরিণতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল চরমপন্থীদের ভাবাদর্শ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।”

২(ক).৮ সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙন

মডারেট বা নরমপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থীদের চিন্তাধারার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে। নরমপন্থী নেতাদের ব্রিটিশ জাতির ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থা অটুট ছিল এবং তাদের দাবী বড়জোর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অবধি যেত। কিন্তু চরমপন্থীরা স্বরাজ বা স্বশাসনের কথা ভাবতেন। তাঁরা নরমপন্থী চিন্তাধারাকে স্থবির ও বস্তাপচা বলে মনে করতেন। অরবিন্দ ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কংগ্রেস যেহেতু ছিল নরমপন্থী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু চরমপন্থীর তার দখল নেবার চেষ্টা করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যান। অরবিন্দ, তিলক, লাজপৎ ও বিপিন পাল ছিলেন চরমপন্থীদের মুখপাত্র। প্রথম থেকেই চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের সমালোচনা করতে থাকে এবং এ সমালোচনা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান বাড়ায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাবকে নিন্দা করা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে গোখলে ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন কিন্তু বিষয় নির্বাচনী সভায় আলোচ্য বিষয়সূচী নির্ধারণের সময় ভয়ানক গণ্ডগোল দেখা যায়। বয়কট ও স্বদেশী প্রস্তাব আলোচনায় নরমপন্থীরা সমর্থন জানালেও প্রস্তাবটি ঘুরিয়ে গ্রহণ করা হয়। চরমপন্থীরা এতে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করলেও বুঝতে পারেন যে, কংগ্রেসে প্রত্যক্ষভাবে বয়কট প্রস্তাব না করালে সর্বভারতীয় স্তরে আবেদন-নিবেদন নীতি চলতেই থাকবে।

চরমপন্থীরা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে তিলককে সভাপতি পদে বসাতে চাইলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ মেহতা কুটবুদ্ধি খাটিয়ে সর্বজনমান্য বর্ষীয়ান নেতা দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করায় চরমপন্থীরা নিরস্ত হন। এই কংগ্রেসে চরমপন্থীরা স্বরাজ, বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব পাশ

করিয়ে নেন। কিন্তু দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের ব্যাখ্যা দেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসন বা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস বলে। বয়কট ও স্বদেশী সম্পর্কেও নরমপন্থীরা এড়িয়ে যাবার মনোভাব দেখান। চরমপন্থীরা যারপরনাই ক্রুদ্ধ হন।

১৯০৭ এর কংগ্রেস নাগপুরে হবার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের লড়াকু মনোভাব দেখে ফিরোজ শাহ মেহতা ১৯০৭ এবং কংগ্রেসের স্থল নাগপুর থেকে সুরাটে সরিয়ে নিয়ে যান। নরমপন্থী রাসবিহারী ঘোষকে নির্বাচন করাটাও তিনি ঠিক করেন। একটা মোকাবিলার জন্য দুপক্ষই তৈরী হয়ে আসে। সভাপতি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ রাসবিহারী ঘোষের নাম সমর্থন করতে উঠলে প্রচণ্ড গণ্ডগোল ও হাতাহাতি এমন কি জুতো ছোঁড়াছুঁড়িও হয়। পুলিশের সাহায্যে অবশেষে শান্তি রক্ষা হয়। নরমপন্থীরা ভোটে জয়লাভ করেন। চরমপন্থীরা কংগ্রেস মঞ্চ ত্যাগ করেন। সংঘাতের জন্য ঠিক কারা দায়ী এ নিয়ে বিতর্ক আছে। লাজপত রায়, তিলক এবং বাঙলায় তার বেশীর ভাগ বন্ধুই সুরাটে অধিবেশনের পরের মাসগুলোয় কংগ্রেসের পুনর্মিলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বোম্বাই এর নরমপন্থী গোষ্ঠী খুব কঠোর মনোভাব দেখান। ১৯০৮ এর এপ্রিলে এলাহাবাদ কনভেনশনে এই ভাঙন চূড়ান্ত হয়। ‘‘যেখানে একটি সংবিধান খাড়া করে কংগ্রেসের পদ্ধতিকে কঠোরভাবে নিয়মতান্ত্রিক বলে স্থির করে দেওয়া হয়, আর প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে নিয়মিত সংস্কার সাধনের ভেতরে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— ‘তিন বছরের বেশী স্থায়ী স্বীকৃত সংস্থার মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনকে বেঁধে রাখা হয়। আগামী অধিবেশনগুলি থেকে চরমপন্থীদের বাদ রাখার জন্যই এইভাবে ইচ্ছে করেই সবরকমের চেষ্টা করা হয়েছিল।’’ আসলে নরমপন্থী নেতারা এইসময় ভারতসচিব লর্ড মর্লের কাছ থেকে শাসন সংস্কারের আশ্বাস পান। তারা মনে করেন যে ইংল্যান্ডে উদারতন্ত্রী দল ক্ষমতায় আসায় তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবীগুলি ব্রিটিশ সরকার শুনবেন।

এই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার নরমপন্থীদের কিছু আশ্বাস দিয়ে চরমপন্থীদের ওপর দমননীতি চাপিয়ে দেন। তিলকের ৬ বছরের জেল হয়। অরবিন্দকে মুরারিপুকুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত করায় তিনি অব্যাহতি পাবার পর রাজনীতি ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় ব্রতী হন। সুতরাং চরমপন্থীরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ‘‘মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্ত ভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।’’

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) এ লিখছেন ''তবু চরমপন্থীরা একটা কথা প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, 'আবেদন নিবেদনের মালা বহি বহি নতশির' নরমপন্থীদের কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। এরাই প্রমাণ করলেন শর্তহীন সহযোগিতার নীতি ভ্রান্ত তা মর্লের শাসন সংস্কারের বেশী কিছু আদায় করতে পারে না। তাঁরা বোঝালেন ইংরাজদের কাউন্সিল মায়ার ছলনা, তার মোহে পড়লে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হয়। তাঁরা দেখালেন ভারতের লক্ষ্য—পূর্ণ স্বরাজ এবং তা অর্জন করতে হবে বীর্য ও মৃত্যুর শুল্কে। নঞর্থক বয়কট ও সদর্থক স্বদেশীর সাফল্য যতই সীমিত হোক, গান্ধীকেও তা গ্রহণ করতে হয়।''

সুরাটের ঘটনার পর মিন্টো মর্লেকে লিখলেন ''কংগ্রেসের পতন আমাদের পক্ষে একটা বড় জয়।'' মর্লে তার উত্তরে লেখেন ''আপাত পতন মনে হলেও চরমনপন্থীরাই একদিন কংগ্রেস দখল করবে।'' কংগ্রেসকে আবার নতুন প্রাণ ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরেকজন নেতার যিনি ভারতরে ম্রিয়মান জাতীয় জীবনে এনেছিলেন এক গণ আন্দোলনের জোয়ার। তিনি হলে গান্ধীজী।

২(ক).৯ সারাংশ

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা মডারেট বা নরমপন্থী বলে পরিচিত। ব্রিটিশ ন্যায় নীতির উপর তাদের অগাধ আস্থা ছিল। তাঁদের 'আবেদন-নিবেদন' নীতির জন্য ক্রমাগতই তারা সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাঁদের দুর্বলতার জন্য তারা সমালোচিত হলেও এ কথা মনে রাখতে হবে যে তারা একটি বৃহৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন যা, শেষ হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে। সমালোচনা যারা করছিলেন তাদের দাবী আরো চরম ছিল বলে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চরমপন্থী বলে পরিচিত। এই নতুন শ্রেণীর নেতৃত্ব বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের ভাবাদর্শে জারিত ছিলেন। তাঁদের উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছিল কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও সামাজিক দিক দিয়ে চরমপন্থীরা মনে করতেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না। আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ শোষণ প্রত্যেকের মনেই এক ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। চরমপন্থী নেতারা এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও চরমপন্থীদের প্রভাবিত করেছিল।

চরমপন্থী আন্দোলনের নেতারা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপৎ রায়। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বাঙলায় যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন নামেই পরিচিত। এই স্বদেশী আন্দোলন ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তার প্রথম ধারাটি হল গঠনমূলক স্বদেশী। আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা বয়কটকে প্রাধান্য দিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনাও এই বয়কটেরই অঙ্গ ছিল। আন্দোলন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নেয়। এইটি স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা। আন্দোলনের সময় শ্রমিক ও কৃষকেরাও

তাদের নিজস্ব দাবীতে মুখর হয়ে ওঠেন। বাংলার এই চরমপন্থী আন্দোলনের জোয়ার পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনেরসূচনায় অসংখ্য মুসলমান নাগরিক এগিয়ে আসা সত্ত্বেও এই সময়েই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে গঠিত হলো মুসলীম লীগ। পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আন্দোলনের ক্ষতি করেছিল।

তবুও একথা বলা যায় যে স্বদেশী যুগে যে ভাবধারা ও আদর্শবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু চরম দমমনীতির মুখে পড়ে স্বদেশী আন্দোলনকে ধীরে ধীরে তার গতিকে হারিয়ে ফেলেছিল। এর জন্য দায়ী ছিল আন্দোলনের মধ্যকার দুর্বলতা। আন্দোলন মোটামুটি ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক চাহিদাকে চরমপন্থীরা তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্গত করতে পারেন নি। হিন্দুজাগরণবাদ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথ ধরার পর তা গণসংযোগ হারিয়ে ফেলল। এই দুর্বলতাগুলি সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে দেশবাসীকে তাঁরা আত্মোৎসর্গ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

নরমপন্থী এবং চরমপন্থী আদর্শের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে। সভাপতি হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ রাসবিহারী ঘোষের নাম উত্থাপন করাতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়। পুলিশ দিয়ে অবশেষে শান্তি রক্ষা হয়। নরমপন্থীরা ভোটে জয়লাভ করেন এবং চরমপন্থীরা মঞ্চ ত্যাগ করেন। ১৯০৮ এর এপ্রিলে এলাহাবাদ কনভেনশনে এই ভাঙন চূড়ান্ত হয়। সংস্কারবাদীর নরমপন্থীরা অপেক্ষা করেছিলেন ভারতসচিব লর্ড মর্লের কাছ থেকে শাসন সংস্কারের জন্য। তাঁরা মনে করেছিলেন যে ইংল্যান্ডে উদারতন্ত্রী দল ক্ষমতায় আসায় তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবীগুলি ব্রিটিশ সরকার শুনবেন। কিন্তু মর্লে-মিন্টো সংস্কার তাদের হতাশাই বাড়িয়েছিল। মিন্টো কংগ্রেসের পতনকে ব্রিটিশ সরকারের জয় বলে অভিহিত করলেও মর্লে কিন্তু বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে চরমপন্থীরাই কংগ্রেস দখল করবে। গান্ধীজীর গণ আন্দোলন কিছু বছর বাদে কংগ্রেসে আবার প্রাণের জোয়ার এনেছিল।

২(ক).১০ উদ্দেশ্য

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

১। চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কে করেছিলেন? জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এই প্রস্তাব কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কয়টি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতা কি ছিল?

স্বল্পকথায় লিখুন—

১। স্বদেশী আন্দোলনের শ্রমিক ও কৃষকেরা কি ভাবে সামিল হয়েছিলেন?

২। সুরাট কংগ্রেসে ভাঙনের কারণ কি ছিল?

অনুশীলনী—

১। চরমপন্থার উদ্ভবের কারণগুলি দশটি বাক্যে লিখুন।

২। স্বদেশী আন্দোলনের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। একটি বাক্যে উত্তর দিন—

ক. বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কে করেছিলেন?

খ. চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা কারা ছিলেন?

গ. কোন পত্রিকা বিদেশী বর্জনের ডাক দিয়েছিল?

ঘ. ‘স্বদেশী’ ও ‘বয়কট’ কথার অর্থ কি?

ঙ. ‘মুসলিম লীগ’ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৪। সঠিক উত্তরটি (✓) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন ঃ

ক. বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কোন সালে ঘোষিত হয়েছিল? (১৯০৩, ১৯০৫, ১৯০৭)।

খ. ‘ডন’ পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত)।

গ. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন (অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক)।

ঘ. সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রভাবিত করেছিল (শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে)।

ঙ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ)

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন —

ক. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল________________প্রমুখ মধ্যপন্থীদের হাতে।

খ. স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা ____________ কে প্রাধান্য দিয়েছিল?

গ. পার্টনার _____________ বয়কট চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন।

ঘ. স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ____________ ও _____________ রচনা করেন।

ঙ. হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনা করেছিলেন ____________।

২(ক).১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908— Sumit Sarkar.
2. Modern India— Sumit Sarkar.
3. স্বাধীনতা সংগ্রাম— বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুন দে।
4. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, (১৮৮৫-১৯৪৭)— অমলেশ ত্রিপাঠি।
5. The Extremist Challenge—Amlesh Tripathi.
6. Militant Nationalism in India— Biman Behari Mukherjee.
7. Indias Struggle for Independence— 1857-1947— Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, Sucheta Mukherjee, K.N. Panikkar.
8. গোরা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
9. ঘরে বাইরে— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
10. কালান্তর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।